ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 17. Number 01. May 2022

কারাগার থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান: প্রেক্ষিত বঙ্গবন্ধু

ড. মোহাম্মদ আজিবার রহমান*

Abstract: Bangabandhu is the dreamer of the independence movement and the great architect of Bangladesh. We got an independent Bangladesh becouse of his uncompromising leadership and boundless courage. Bangladesh has a long history behind its creation. Bangabandhu is the great hero of this history. He has fought all his life for the liberation of the Bengali nation. Unlimited persecution, round up, jail, fear of death, execution order nothing could distract him from his destination. This descriptive essay traces the course of events up to declaration of independence of Bangabandhu, his arrest, imprisonment in Pakistan, mock trial, world response, release from prison and return via London-Delhi to his homeland. The article will enrich the knowledge of the inquisitive reader. This will inspire the new generation in the ideals of Bangabandhu. They will be inspired to be patriotic citizens and encouraged to build the Bengal expected by Bangabandhu. However, this article provides vital elements for recent historians and researchers tomorrow.

মূলশব্দ: কারাগার, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু[১] শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] তিনি বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির পিতা।[৩] কালজয়ী এই মহাপুরুষ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো তাঁকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করে অকৃত্রিম ভালোবাসায় বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।'[৪] আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িকী *নিউজ উইক* বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করেছে।[৫] নতুন মিসরের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হাসনাইন হাইকেল বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি সারা বাঙালি জাতির মুক্তিদূত।'[৬] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সাংবাদিক সিরিলডন *টাইম ম্যাগাজিনে* লিখেছিলেন, 'মাতৃভূমিকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার জন্য বর্তমানের চমকপ্রদ নাটকীয় যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার ঘটনা শেখ মুজিবের এক দিনের ইতিহাস নয়, বিশ বছর ধরে এটি তাঁর লক্ষ ছিল। এ দীর্ঘ যাত্রায় এক

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউভার্সিটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

যুগের বেশি সময় ধরে কারাগার হয়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর আবাস।'[৭] বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। তিনি ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে স্কুলের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন এবং বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন পাকিস্তান শাসনামলে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলে ১৮ বার জেলে গেছেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন দু'বার।[৮] তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে নিজ বাসা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ দশ মাস ফাঁসির আসামী হিসেবে তিনি পাকিস্তান কারাগারে আটক ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও ২৬ মার্চের ঘোষণা বুকে ধারণ করেই সমগ্র জাতি মরণপন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান এবং জনগণের দাবির মুখে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি লন্ডন-নয়াদিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ৫৪ বছরের জীবনের এক চতুর্থাংশ সময় কারাগারেই কাটাতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। অর্থাৎ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কারাগারেই অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে উচ্চতর কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। সে কারণে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। প্রবন্ধটি থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিশ্লেষক, রাজনীতিবিদসহ অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

২৫ মার্চের ঘটনা প্রবাহ এবং বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল উত্তাল আর উত্তেজনায় ভরপুর। ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসন কার্যত অচল হয়ে যায়। এ সময় প্রকৃতপক্ষে দেশ পরিচালনা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন গভর্নর হাউস নয়, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবনই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তানি নেতা খান মো. ওয়ালী খান বলেছেন, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এবারের অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও শক্তিশালী।'[৯] পাকিস্তানী নেতা আজগর খান ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর বলেছিলেন, 'ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউস ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়তে তিনি দেখেননি।'[১০] চারিদিকে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন। বহু বৈঠকও হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে। কখনো রুদ্ধদার আবার কখনো দু'জনের সাথে ছিল নিজ নিজ পরামর্শক টিম। একটা বিষয় আগেই নির্ধারিত ছিল যে, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা এবং আরো কয়েকটি এলাকায় একযোগে 'এ্যাকশন' শুরু হবে। এই 'এ্যাকশনের' নামকরণ করা হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'।[১১] ২৫ মার্চ রাত ১০টায় পাকিস্তানীরা ঠাণ্ডা মাথায় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল।[১২]

২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মী এ এইচ এম কামারুজ্জামান, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন ও গাজী গোলাম মোস্তফাকে নিয়ে অধিকাংশ সময়ে ৩২ নম্বর বাড়ির নিচে লাইব্রেরি রুমে বসে পরামর্শ করেন। সেদিন সবার চোখে মুখে ছিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সারাদিন দলে দলে মানুষ এসেছিল ৩২ নম্বরে। প্রতিটি মিছিলের সামনে এসে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন এবং সবাইকে সর্বাত্মক

সংগ্রামের জন্য তৈরি হবার আহব্বান জানান। তিনি আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে স্ব স্ব এলাকায় পাঠিয়ে দেন। সন্ধ্যায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে এএইচএম কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম পুনরায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক তারিক আলীর বাবা মাজহার আলী বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে এসে বলেন, 'ইয়াহিয়া আর আলোচনার মধ্যে নেই, সামরিক অ্যাকশনে যাবেন।' বঙ্গবন্ধু তাকে বলেন, 'এতে কোন লাভ হবে না, তাঁর কবরের উপর বাংলাদেশের জন্ম হবে'।[১৩] এদিকে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অতি সংগোপনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।[১৪] জেনালের টিক্কা খানকে হত্যাযজ্ঞ চালানোর যথাযথ আদেশ দিয়ে রাত সাড়ে আটটায় ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো গোপনে বোয়িং ৭০৭ বিমানে পালিয়ে যান।[১৫] করাচী পৌঁছে ইয়াহিয়া মদ পানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।[১৬] রাত ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে ঢাকায় পুরোদমে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছিল অনেক পূর্বেই। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল সময় ক্ষেপণ করা এবং তাঁকে ধোঁকা দেওয়া। আর সেই সুযোগে প্রচুর সেনা মোতায়েন ও অস্ত্র মজুদ করা। গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে টিক্কা খান তাঁর সাথীদের নিয়ে ডিনার খেতে বসেন।[১৭] ২৫ মার্চ সকাল ১১ টায় টিক্কা খান খাদেম হোসেন রাজাকে ফোন করে বলেন, 'রাজা আজ কিন্তু সেই রাত্রি'। সে সময় টিক্কা খান গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক এবং জেনারেল নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। অপারেশন কোনভাবে যেন ব্যর্থ না হয় সেজন্য ইয়াহিয়া বিকল্প হিসেবে মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল মিঠাকে জরুরিভাবে ঢাকায় পাঠান। খাদিম হোসেন রাজা ও রাওফরমান আলী অতর্কিতে আক্রমন চালাতে অস্বীকার করলে তাদের স্থলে উপরোক্ত জেনারেলদের দায়িত্ব দেওয়া হবে।[১৮] ২৫ মার্চের কথা নিয়াজি নিজেই বলেছেন, 'টিক্কা খান যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তাতে ঢাকা পরিণত হলো জ্বালাও-পোড়াও-এর শহরে, সেটা পরিণত হলো চেঙ্গিচ খানের বোখারা আর বাগদাদ ধ্বংস এবং ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের জালিওয়ানওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ডের মত।'[১৯]

২৫ মার্চ রাত ১১টার দিকে শেখ হাসিনা বাসার নিচে এসে বলেন, 'অবস্থা খুবই খারাপ, সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে।' বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ করে তিনি বলেন, 'আপনিও আসুন বাবা, আমাদের যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'মা হাসু, তোকে সারাদিন একটুও সময় দিতে পারিনি, চল কথা বলি।'[২০] রাত ১২টার কিছু পূর্বে জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনা ৩২ নম্বর বাসা ত্যাগের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'তিনি কোথায় যাবেন? জবাবে তিনি বলেন, 'আমার এখন অন্যত্র চলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই তারা আমাকে মারতে চাইলে এ বাসাতেই মারতে হবে'।[২১] তিনি ওয়াজেদ মিয়াকে বললেন, 'তুমি যে বাসা ভাড়া করেছ সেখানে হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে এখুনি চলে যাও। কামাল ও ল্যাফটেনেন্ট শেখ জামালকে বললেন, 'তোমাদের কাজ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা। সবাই বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। রাত ১২টার দিকে ড. ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিয়ে চলে যান। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্য বাসা ঘিরে ফেলে।[২২] তখন শেখ মুজিব, বেগম মুজিব, জামাল ও রাসেল বঙ্গবন্ধুর সাথে বাড়িতেই ছিলেন।'[২৩] 'র'-এর লোকজন দীর্ঘ ১২ ঘণ্টা ধরে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ত্যাগের অনুরোধ করেন। তাঁর কথায়, 'শত্রু সেনা আমাকে না পেলে ঢাকা তছনচ করে ফেলবে,

আমার দেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিবে। আমি যাব না, যদি মৃত্যু আসে আসুক, আমার দেশের মানুষের মাঝে, তাদের সঙ্গে মরতে চাই।'[২৪] ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, ২৫ মার্চ রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সকলকে মুজিব ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। অনেকেই তাঁকে আত্মগোপনের অনুরোধ করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর জবাব ছিল–'আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।'[২৫]

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের আগেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। রাত সোয়া ১২টায় বঙ্গবন্ধু গোলাপী ও আকাশী রঙের দুই শিট কাগজ নিয়ে তাতে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে স্বাক্ষর করেন।[২৬] তাঁর ভাষায়, 'আজ বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। একে যেমন করে হোক শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে।'[২৭] স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়ে পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল সিদ্দিক সালিক উল্লেখ করেছেন, 'প্রথম গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিবের কণ্ঠ পাকিস্তানি রেডিও'র ওয়েভ-এর কাছাকাছি বেতার তরঙ্গে ভেসে আসে। পূর্বে রেকর্ডকৃত ভাষণের মতই তা শোনা যাচ্ছিল। শেখ পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন।'[২৮] বঙ্গবন্ধুর বাণীটি চট্টগ্রামে তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মীদের কাছে পৌঁছে গেলে ২৬ মার্চ দুপুরের আগেই হ্যাণ্ডবিল আকারে তা চট্টগ্রাম শহরে বিলি করা হয়।[২৯] বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রেরণ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই পাকবাহিনীর হাতে তিনি বন্দি হন।[৩০] বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে ৫০ জন কমান্ডোকে প্রেরণ করা হয়। নেতৃত্ব দেন ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিডেগ মেজর জাফর।[৩১] রাত সোয়া ১টায় সেনাবাহিনী চারদিক থেকে অনবরত গুলি চালাতে থাকে। প্রবল গুলির মধ্যেও দোলতলা থেকে একাই বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে চিৎকার দিয়ে বলেন, 'স্টপ ননসেন্স। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? সৈন্যরা তাঁকে গুলি করতে উদ্যত হলে কর্তব্যরত কমান্ডিং অফিসার জেড. এ. খান বলেন, 'হুকুম হ্যায় জিন্দা পাকড়ানেকা'।[৩২] তখন বঙ্গবন্ধু একটু সময় নিয়ে উপরে আসেন। তিনি ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেন। কারো সাথে কথা বলেননি। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত দেড় টায় তিনি সেনা-কনভয়ের গাড়িতে ওঠেন।[৩৩] বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের জন্য পরিচালিত অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন বিগ বার্ড'।[৩৪] তাঁকে গ্রেফতার করে মেজর ওয়ারল্যাসে বার্তা পাঠায় `BIG BIRD IN THE CAGE…OTHERS NOT IN THEIR NESTS…OVER.'[৩৫] সিদ্দিক সালিক বলেন, 'সে সময় আমি বন্ধু মেজর বিল্লালের কাছে জানতে চাইলাম, কেন সে উত্তেজনা মুহূর্তে মুজিবকে শেষ করে দিল না।' সে বলল, 'মুজিবকে জীবন্ত গ্রেফতারের জন্য জেনারেল টিক্কা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'[৩৬] ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী সে রাতে আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তারা আমাকে মেরে ফেলত যদি আমি বাড়ির বাইরে আসতাম। মেরে ফেলার পর বলত চরমপন্থীরা আমাকে খুন করেছে। আমাকে মেরে ফেলার অজুহাতে ইয়াহিয়া খান আমার দেশের মানুষকে খুন করত। তারা হত্যাযজ্ঞ চালাত।'[৩৭]

স্বাধীনতার ঘোষণার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা যে যৌক্তিক ছিল সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙালি জনতার ঐক্যবদ্ধ ও স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে নিরস্ত্র বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেনাবাহিনীর ওপর। শুধু তাই নয়, কয়েকটি রাষ্ট্র যথা, চীন, আমেরিকা, ইরান প্রভৃতি বাদ দিলে সমগ্র বিশ্বই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারত বাংলাদেশকে সামরিক শক্তি, শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান করে, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিত্রবাহিনী গড়ে তোলে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলেন। সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের পেছনেই ধেঁয়ে আসে রাশিয়ার সাবমেরিন। আমেরিকার প্রশাসন পাকিস্তানকে সমর্থন দিলেও জনসাধারণ কিন্তু নির্যাতিত বাংলার মানুষের প্রতি ছিল সমবেদনশীল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, তারকা সংগীত শিল্পী ও মানবাধিকার কর্মীরা বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের পাশে ছিলেন। যুগোস্লাভিয়া, জার্মানি, ভেনিজুয়েলা, ফ্রান্স, সুইডেন, আর্জেন্টিনা, সেনেগাল, পোল্যান্ড, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা ঘোষণাকে যৌক্তিক মনে করে। **১৯৭১** সালের ২ জুলাই ইসরায়েল আইনসভায় বাঙালির ওপর পাকিস্তানের সামরিক চক্রের ধ্বংসকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব পাস করে।[৩৮] এমনকি যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওষুধ ও খাবার পাঠায়। কিন্তু বাংলাদেশ তাদের এই সহানুভূতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।[৩৯]

ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক ৭০ বছর বয়সী আন্দ্রে মার্লো ঘোষণা করেছিলেন, 'বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অস্ত্র হাতে নিতে আমি প্রস্তুত।'[৪০] এমন ঘোষণা দিয়ে পুরো ইউরোপজুড়ে তখন তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোরালো সমর্থন গড়ে ওঠে। **১৯৭১** সালের ৩ ডিসেম্বর ফ্রান্সের অরলি বিমানবন্দরে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পিআইএ) 'সিটি অব কুমিল্লা' নামের একটি বোয়িং ৭২০ বি বিমান ছিনতাই করেন ২৮ বছর বয়সী ফরাসী যুবক জঁ ক্যা। পাইলট আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি হিসেবে বিমান চালু করতেই পকেট থেকে পিস্তল বের করে জঁ ইঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ওয়ারলেসটি কেড়ে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে জঁ নির্দেশ দিলেন, বিমানটিতে যাতে ২০ টন ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী তুলে তা যুদ্ধাহত ও বাংলাদেশি শরণার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। বললেন, 'আমার এই দাবি নিয়ে কোন আপোষ চলবে না (নন নেগোশিয়েবল)।'[৪১] আমেরিকার পপ সংগীত তারকা জর্জ হ্যারিসনের ব্যান্ড পার্টি ব্রিটলস **১৯৭১** সালে নিউইয়র্কের ম্যাসিন স্কয়ারে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর আয়োজন করে। উক্ত কনসার্ট থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার অনুদান সংগৃহীত হয়। যার সবটাই বাংলাদেশে নিপীড়নের শিকার মানুষের জন্য প্রদান করা হয়। জোয়ান বায়েজ 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' শিরোনামে গান রচনা করেন। সাইমন ড্রিং পাকিস্তানীদের গণহত্যার খবর বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন। জাতিসংঘের মহাসচিব মিয়ানমারের নাগরিক উথান্ট পাকিস্তানীদের গণহত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অস্ট্রেলীয় নাগরিক ডব্লিউ এস. ওভারল্যান্ড বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেন। সিডনি স্যাণ্ডবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসে পাকিস্তানীদের অপকীর্তি নিয়ে রিপোর্ট করেন। এ কারণে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করে। এডওয়ার্ড এফ. কেনেডি মার্কিন কংগ্রেসে আমেরিকার পাকিস্তানঘেষা পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ব্রিটিশ সাংবাদিক এ্যান্থনি মাসকারেনহাস বিবেকের তাড়নায় বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানীদের গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন। গণহত্যা নিয়ে রচিত তাঁর বই 'রেইপ অব

বাংলাদেশ' এবং 'লিগ্যাসি অব ব্লাড'। ডেইলি টেলিগ্রাম, গার্ডিয়ান, নিউ স্টেটম্যান, টাইমস, ইকোনোমিস্ট, সানডে টাইমস, অবজারভার, বিবিসি ইত্যাদি সংবাদ মাধ্যম স্বাধীনতা ঘোষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরে।[৪২] যে কারণে ঢাকার রেসকোর্সে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মাত্র তিন মাসের মধ্যে বিশ্বের ৫৪টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[৪৩] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য **২০১১** সালের **২৫** জুলাই, **২০১২** সালের **২৪** মার্চ, **২০** অক্টোবর ও ডিসেম্বরে চারটি ধাপে মোট **৭১৩** বিদেশী বন্ধু ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।[৪৪]

যুদ্ধ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মূলতঃ ওই ভাষণেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। পাকিস্তানের সেনা গোয়েন্দা 'আইএসআই' রিপোর্টে শেখ মুজিবকে 'চতুর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, 'শেখ মুজিব কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারলাম না।'[৪৫] ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমন্ডি **৩২** নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।[৪৬] ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই **১৮** দিনে এই ভাষণ বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষকে প্রস্তুত করেছে মুক্তির সংগ্রামে, স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর **১৯৭২** সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেছিলেন, 'গত ৭ মার্চ (১৯৭১) তারিখে আমি জানতাম পৈশাচিক বাহিনী আমার মানুষের ওপর আক্রমণ করবে। আমি বলেছিলাম, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আমি বলেছিলাম, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমি বলেছিলাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার লোকেরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বৃদ্ধ লোক থেকে বালক পর্যন্ত সকলেই সংগ্রাম করেছে।'[৪৭]

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ঢাকার গণহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া বাঙালি সেনা, ছাত্র, সাধারণ জনতার সমন্বয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একটি সামরিক বাহিনী। জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী এই বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সকল সেনা ও জনতার বাহিনীকে 'মুক্তিবাহিনী' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। ২৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া গণহত্যা চলে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা **১০**ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠন করে। **১৭**ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ছয় সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং

তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভা বঙ্গবন্ধুর পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা।[৪৮] ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের ৮ দিন পর মুজিবনগর সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর লন্ডন-দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকলেও তিনি মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকেন। ১০ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪৯]

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবার

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সীমাহীন কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পরপরই আমাদের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে (পুরাতন), (বর্তমান সড়ক নম্বর ১১, বাড়ি নম্বর ১০) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং আমার পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাঁকে গ্রেফতারের পর আমার মা ছোট দুই ভাই রাসেল ও জামালকে নিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন।'[৫০] পরবর্তীতে বাসা পরিবর্তন করতে হয়েছে। নিকট আত্মীয়তরা বাসা ভাড়া দিতে সাহস না করলেও ওয়ারীতে এক ভদ্রমহিলা বঙ্গবন্ধুর নাম শুনে বিপদের আশংকার মধ্যেও আন্তরিকতার সাথে বাসা ভাড়া দেন। বঙ্গবন্ধুর মেজো ফুফুর ছেলে মমিনুল হক খোকা বলেন, 'নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে যে অনাদর-ঔদাসীন্য পেয়েছি সেদিন সব কাটিয়ে উঠতে পেরেছি স্নেহশীলা খালা আম্মা আর তেজস্বী এই রমণীর সংস্পর্শে এসে। কী দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার পর অনেক চেষ্টা করেও এই মহিলার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি।'[৫১] মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধু পরিবার ধানমন্ডির ১৮ নম্বর বাড়িতে ছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, আমার ভাই লে. শেখ জামাল, বোন শেখ রেহেনা, ছোট ভাই শেখ রাসেল, আমি ও আমার স্বামী ড. ওয়াজেদকে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে একটি একতলা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হলো।'[৫২] মেজর ওমর বেগম মুজিবকে বলেছিলেন, 'হয় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে যাবেন, না হয় সেনানিবাসে থাকতে হবে।' ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বলেছিলেন, 'তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'[৫৩] ইস্টার্ন ব্যাংকের একটি চেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর প্রাপ্তির মাধ্যমে বেগম মুজিব জানতে পারেন যে, শেখ মুজিব জীবিত আছেন।[৫৪] ওই বাসাতেই শেখ হাসিনার একমাত্র পুত্র জয়ের জন্ম হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'যদি পুত্র হয় তাহলে নাম রাখবে জয়, আর যদি কন্যা হয় তাহলে নাম রাখবে জয়া।[৫৫] শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা যে বাড়িতে ছিলাম তার ছাদের উপর দু'দিকে দুটো ব্যাংকার করে মেশিনগান বসানো হয়েছিল। এ ছাড়া আরো একটা গ্যারেজের ছাদে করা হয়েছিল। বাগানের মাটি কেটে বেঞ্চ করা হয়েছিল। দিন রাত গুলির আওয়াজ। যখন বিমান আক্রমণ হয় তখন রাসেল বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়...। কেবল আমরা যারা ছিলাম তাদের মৃত্যুর প্রতীক্ষা গুণতে হয়। ৪ মাসের জয়কে নিয়ে হয় সমস্যা। বিছানায় শোয়ানো যায় না, গুলির আওয়াজে কেঁপে ওঠে। রাসেলকে নিয়ে হয়েছে আরো মুশকিল। বিমান আক্রমণ শুরু হলেই সে বারান্দায় ছুটে যেতে চায় অথবা সোজা মাঠে বিমান দেখতে। অনেক কষ্টে ওকে ধরে রাখতে হয়। কিছুতেই বোঝানো যায় না। মা, রেহেনা, আমি যে

যখন পারি ওকে আটকিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। ঘরের ভিতর মাদুর পেতে মাটিতে সকলকে নিয়ে বসে জানালা দিয়ে বিমান যুদ্ধ দেখি, আর প্রতিক্ষায় থাকি কখন শত্রুমুক্ত হবে দেশ।[৫৬] ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলেও বাসায় অবস্থানরত সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে স্যারেন্ডার করতে বাধ্য হয়। ১৭ ডিসেম্বর জেনারেল অরোরা বেগম মুজিবের সাথে সস্ত্রীক সাক্ষাৎ করেন। এরপর থেকে ভারতীয় সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে স্বদেশে ফিরে ওই বাসাতেই ওঠেন। আবুল মনসুর আহমদ বলেন, '২৫ মার্চের আগে কেউ পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি আর ২৫ মার্চের পর কেউ এক থাকতে চায়নি।[৫৭] তারপর থেকে শেখ মুজিব হলেন জাতির প্রতীক।[৫৮]

লায়ালপুর কারাগারে বঙ্গবন্ধ

বঙ্গবন্ধু নয় বার কারারুদ্ধ হয়েছেন।[৫৯] আঠারোটি মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় জড়ানো হয়েছে। দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন।[৬০] মনি হায়দার লিখেছেন, 'তিনিই একমাত্র বাঙালি যিনি তাঁর যৌবনের অধিকাংশ সময় পাকিস্তানী শাসকদের সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন। এমনকি তাঁর বড় মেয়ে শেখ হাসিনার যখন বিয়ে হয় তখনও তিনি কারাগারে। সদ্য বিবাহিত শেখ হাসিনা এবং জামাতা পরমানু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ কারাগারে গিয়ে শেখ মুজিবের আর্শীবাদ নিয়ে এসেছিলেন।'[৬১] ২৫মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়, রাতে আদমজী হাই স্কুলে রাখা হয়। পরদিন তাঁকে ফ্লাগ স্টাফ হাউসে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তিন দিন পর তাঁকে বন্দি অবস্থায় বিমানযোগে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।[৬২] ২৬ মার্চ জেনালে ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন।[৬৩] বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর কারাগারে আটক রাখা হয়,যা বর্তমানে ফয়সালাবাদ সেন্ট্রাল জেল নামে পরিচিত। পাঞ্জাব প্রদেশের ঐ কারাগারটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ভগৎ সিং এই কারাগারেই বন্দি ছিলেন। এখানে বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাখা হয়। চার দেওয়ালের ছোট কক্ষটিতে ছিল একটি বিছানা, আর ধরাছোঁয়ার বাইরে একটি জানালা। তিনি নিজেও জানতেন না তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, 'বাইরের দুনিয়ার সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। কোন পত্রিকা, বই অথবা পরিবারের কাছ থেকে পত্র কিছুই ছিল না ২৭ ডিসেম্বর অবধি। যেসব অফিসার আমাকে পাহারা দিত ও প্রহসনের মামলায় যেসব লোক জড়িত ছিল তাদের বাইরে গোটা নয় মাসে আর কাউকে দেখিনি।'[৬৪] তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন।[৬৫]

বিচার

লন্ডনের ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এর সাথে ১৯ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন, 'মুজিবের বিচার সামরিক আদালতে হবে। মুজিবকে একজন আইনজীবী দেয়া হবে, তবে তিনি হবেন অবশ্যই পাকিস্তানি। তিনি আরো বলেন, 'মুজিবের বিচার হবে এবং এর মানে এই নয় যে, আগামীকালই তাঁকে গুলি করে মারা হবে। সামরিক আদালতে শেখের বিচার হবে এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেলরা চাপ দিচ্ছে। আমি সম্মত হয়েছি এবং খুব শীঘ্রই বিচার অনুষ্ঠিত হবে।'[৬৬] ৪ আগস্ট পাকিস্তানের সবগুলো টিভি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আবারও বলেন যে, সম্প্রতি বেআইনি ঘোষিত

আওয়ামী লীগ পার্টির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের এখন বিচার করা হবে। রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক' কার্যকলাপের জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দেশের আইন অনুসারেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৬৭] রাওয়ালপিন্ডি থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে রহিমুদ্দিন খান সামরিক আদালতে বিচার কাজ শুরু হয়। বিচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে তাঁকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়।[৬৮] একটি একতলা লাল ইটের আদালত ভবনটি ছিল মূল কারাগারের লাগোয়া। বঙ্গবন্ধুকে আদালতে প্রবেশ করতে হত লম্বা সরু করিডোর দিয়ে। সেখানে ছিল চারটি ভারি লোহার দরজা। প্রত্যেক দরজার পাশে মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ পোশাকে সজ্জিত সৈনিকরা দাঁড়িয়ে থাকত। আদালত কক্ষে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধু উপেক্ষা করতেন বিচারকার্য।[৬৯] প্রধান বিচারপতি ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। অন্য সদস্যদের ২ জন হলেন সেনা কর্মকর্তা একজন নৌবাহিনীর অফিসার ও পাঞ্জাবের জেলা জজ। আদালত ৪ সপ্তাহ চলার পর মুলতবি হয়ে যায় এবং আবার শুরু হয় ৭ সেপ্টেম্বর। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আইনজীবী হিসেবে প্রখ্যাত আইনজীবী এ. কে. ব্রোহীর নাম বলেন। তাঁর সহযোগী হিসেবে দেয়া হয়েছিল আইনজীবী গোলাম আলী মেনন, আকবর মির্জা ও গোলাম হোসেনকে। অবশ্য আদালতের ভাবগতিক দেখে বঙ্গবন্ধু ব্রোহীকে অব্যাহতি দেন।[৭০]

বিচারকার্য চলাকালে প্রধান বিচারক জানতে চেয়েছিলেন আপনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন কি না? বঙ্গবন্ধু উত্তরে বলেছিলেন, ‘আপনারা যখন আমাকে মেরে ফেলবেন, তখন আর বিবৃতি দিয়ে কি হবে। তবে আমি চাই আমার মৃত্যুর পরে যেন লাশটা আমার প্রিয় বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।’ একবার আদালতের কার্যবিবরণী তাঁকে দেওয়া হলে তিনি তার উপর লিখে দিলেন সব মিথ্যা।’ আরেকবার লিখলেন, ‘কাকে বলে রাষ্ট্রদ্রোহীতা? আমরা যে নির্যাতিত এটা মনে করা কি রাষ্ট্রদ্রোহীতা?’ একবার আদালতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘মাননীয় বিচারক, অনুগ্রহ করে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের চলে যেতে বলুন। কেননা আপনি জানেন এটা একটা হাস্যকর বিচার। আমি একজন সিভিলিয়ান। আমি মিলিটারির লোক নই। আমার বিচার হচ্ছে কোর্টমার্শালে। এটা যিনি করেছেন সেই ইয়াহিয়া খান স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।’[৭১] ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমি যখন দেখলাম, এ বিচার এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে দাঁড়িয়ে বললাম, জনাব বিচারপতি দয়া করে আমার সমর্থনকারী উকিলদের চলে যেতে বলেন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এটা হচ্ছে এক গোপন বিচার। আমি বেসরকারি লোক, আমি সামরিক লোক নই-আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল। ইয়াহিয়া কেবল প্রেসিডেন্ট নন, তিনি সামরিক আইন প্রশাসকও বটে। এ রায়কে অনুমোদন করবেন তিনি, গঠনও করেছেন তিনি স্বয়ং।’[৭২]

সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন বাঙালি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, কর্নেল মাসুদ এবং কর্নেল ইয়াসিন। এদের মধ্যে কর্নেল মাসুদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িক ছাত্র। চল্লিশের দশকে কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। কোর্টে বঙ্গবন্ধুর সাথে তার চোখাচোখি হলে বঙ্গবন্ধু সেসময় মুচকি হাসেন। মূলত তাদের উপর অমানসিক নির্যাতন করে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়।[৭৩] ৩ ডিসেম্বর বিচার কাজ শেষ হয় এবং ৪ ডিসেম্বর আদালত সর্বস্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধুর ওপর আনিত সকল অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মোট ১২টি অভিযোগ আনা হয়। ১২টি অভিযোগের মধ্যে ৬টি অভিযোগের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ফাঁসি।’[৭৪] রায়ের দিন বেসামরিক বিচারক

অনুপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত দানে বিরত থাকেন।[৭৫] যখন বিচার চলে তখন তিনি আইনসভার সদস্য। যে সমস্ত আইনসভার সদস্যের পদ বাতিল করা হয়েছিল তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল না। আদালতে রায় শুনে তিনি বলেন, ‘আমাকে যখন আপনারা মেরেই ফেলবেন, আমি চাই তারপর আমার মৃত দেহটা যেন আমার প্রিয় বাংলায় পাঠানো হয়। তার বিচারের ক্ষমতা এই আদালতের নেই, কেননা, তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি।’[৭৬] মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল, কেবল বাকি ছিল ইয়াহিয়ার স্বাক্ষর। বিচারের নামে হত্যা-যাকে বলা হয় জুডিশিয়াল মার্ডার। এটা ছিল পূর্বে স্থিরকৃত বিচার।[৭৭]

মিয়ানওয়ালী কারাগারে বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধুকে হেলিকপ্টার যোগে মিয়ানওয়ালী কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। মিয়ানওয়ালী কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কয়েদি নম্বর ছিল ৭৩।[৭৮] কারাগারেতাঁকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়।[৭৯] তাঁকে পোকাযুক্ত ভাত খেতে দেওয়া হত। সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের সাবেক সদস্য ভোলার চরকুমারিয়া গ্রামের আব্দুল মালেক ওই সময় মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি বলেন, ‘ভাত দেওয়ার আগে প্রতিদিনই আমি পোকা বেঁছে দিতাম। সেই ভাত আশরাফ (জেলের মুন্সি) বঙ্গবন্ধুর সেলে দিয়ে আসত। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেন, ‘অর্ধেক সাবান দিয়েই আমাকে সব করতে হয়। আমার খুব খারাপ লাগে।’ আমি পরদিন আমার অ্যালাউন্সের ৪৮ টাকা দিয়ে ইংল্যাণ্ডের তিনটি ইম্পেরিয়াল লেদার সাবান বাইরে থেকে একজনকে দিয়ে কিনিয়ে আনি। এরপর পোগনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে দেই। তিনি সাবান পেয়ে কেঁদে ফেলেন। শিকের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আমার গালে চুমু খেয়ে বলেন, ‘কতদিন ছেলেমেয়েদের মুখ দেখিনি। বাংলা কথা শুনিনি। একজন বাঙালিও দেখিনি। তোমাকে দেখে ওদের কথা খুব মনে হচ্ছে। আমি যদি এখান থেকে বেঁচে দেশে ফিরে যেতে পারি তুমি আমার সাথে দেখ করবা।’[৮০]

সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘কিছু কয়েদিকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। খুব ভোরে আমাকে হত্যার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু জেলের একজন অফিসার আমার প্রতি বেশ সদয় ছিলেন। তিনি আমার খোঁজ-খবর রাখতেন। একদিন রাত তিনটার সময় তিনি আমাকে ডেকে তুলে কারাগারের বাইরে নিয়ে যান এবং তার বাংলোয় সামরিক পাহারা ছাড়াই লুকিয়ে রাখেন। দুই তিন দিন পর আমাকে ঐ বাংলো থেকে সরিয়ে কলোনীতে লুকিয়ে রাখে। সেখানে তিনি আমাকে চার-পাঁচ দিন লুকিয়ে রাখেন। কেউ আমার অবস্থান জানত না। জেলের কয়েকজন ক্ষুদ্র কর্মকর্তা আমার সন্ধান জানতেন। সেই অফিসারের নাম আব্দুর রশিদ’।[৮১]

জুলফিকার আলী ভুট্টো আমেরিকা থেকে ইসলামাবাদে ফিরে সরাসরি প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি জানতে জান, শেখ মুজিব জীবিত আছেন কি না? উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘হ্যা’। যখন মৃত্যুদণ্ড হবে তখন তা প্রকাশ করা হবে। তখন ভুট্টো বলেন, ‘তাকে শহিদ বানিয়ে আমাদের কোন লাভ হবে না।’ এতে মানুষ আমাদের উপর বিরক্ত হবে, পৃথিবী বিপক্ষে যাবে। আমেরিকাও সমর্থন করবে না। ইয়াহিয়া তখন বলেন, ‘আমেরিকাকে আমি ভয় পাই না, আমেরিকা আমার পকেটে’।[৮২] ইতালির সাংবাদিক ফ্যালাবিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো খান

বলেন, 'ইয়াহিয়া তখন আমাকে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হলো মুজিবকে হত্যা না করা, চাইলে এ কাজ আপনি শেষ করতে পারেন।'[৮৩] তখন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো কারাগারের প্রিজন হাবীব আলীর কাছে এ মর্মে জরুরি বার্তা পাঠান 'যেন শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়।'[৮৪] যথারীতি হাবীব আলী ট্রাক নিয়ে কারা ফটকে আসে এবং সেলের মধ্যে গিয়ে মুজিবকে তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু প্রথমে বাঁধা দেন। হাবীব আলী তখন বলেন 'শেখ, আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্খী। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে এসেছি। কারণ এখানে কমান্ডো আসতে পারে। তারা আপনাকে হত্যা করবে। আমার ওপর আপনি আস্থা রাখুন।' অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে প্রিজন হাবীব আলী তার 'চশমা ব্যারাজ' নামক বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্ত্রীর কাছে টেলিফোন করার ইচ্ছা পোষণ করলে হাবীব আলী বলেন, 'এটা সম্ভব নয়, আমার একমাত্র কাজ আপনার জীবন রক্ষা করা।' তখন বঙ্গবন্ধু বলেন 'আমি কি খবরের কাগজ পড়তে পারি'। হাবীব আলীর উত্তর ছিল, 'না'। এরপর বঙ্গবন্ধু বলেন 'আমি কি এক কাপ চা পেতে পারি?' তখন তাঁকে এক কাপ চা দেয়া হয়। এ বাড়িতে বঙ্গবন্ধু ২ দিন অবস্থান করেন। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি হাবীব আলী বঙ্গবন্ধুকে'শাহুল্লা' নামকস্থানে অবস্থিত একটি রেস্ট হাউসে নিয়ে যান। শাহুল্লা এক সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর রেস্ট হাউস ছিল।[৮৫] রাওয়ালপিন্ডি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শাহুল্লা রেস্ট হাউসে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন।[৮৬] পাকিস্তানের নব্বই হাজারের বেশি সৈনিক তখনও ভারতের কাছে বন্দি।[৮৭]

ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এটা নির্ভেজাল সত্য। ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে বলেন, 'শেখ মুজিবকে হত্যা না করে আমি ভুল করেছি। তিনি জনাব ভুট্টোকে বলেন, 'ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে মুজিবকে হত্যার অনুমতি ছিল, কিন্তু ভুট্টো তাতে সম্মত হননি। ভুট্টো চিন্তা করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বহু সমরিক ও বেসামরিক লোক আছে। শেখ মুজিবের কিছু হলে কেউ ফিরে আসবে না। ফলে একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড হবে। এ ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। এমন কথা চিন্তা করেই ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে দেননি।[৮৮] এমনকি পেছনের তারিখ দিয়েও তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব ছিল ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে। যুক্তি ছিল দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অক্টোবর মাসেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রচার করা হবে।[৮৯] উল্লেখ্য যে, ২০ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২১ ডিসেম্বর বিদেশি সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে, তবে তার পূর্বে তাঁকে গৃহবন্দি রাখা হবে।'[৯০]

বিশ্ব প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বনেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন ছিলেন। ৫ আগস্ট ভারতের লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেন, 'ইয়াহিয়া এক সময় শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আর এখন বলছেন তাঁর ফাঁসি হবে। ভারত এজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছে।'[৯১] ৯ আগস্ট ভারতের লোকসভায় দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিচার প্রহসনকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, যা বিশ্ববাসীর নিন্দাই প্রাপ্য বলে উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে লোকসভার ৫০০ সদস্য

একই মত পোষণ করেন।[৯২] ১০ আগস্ট তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টকে একটি বার্তা পাঠান। তাতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরুর ব্যাপারে পাকিস্তানের ঘোষণায় সবার মর্মাহত হওয়ার কথা বলেন। ঐ দিনই জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে শেখ মুজিবের বিচার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[৯৩] পাকিস্তানের গোপন সামরিক আদালতে বিচার শুরু করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিবৃতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১০ আগস্ট বিশ্বের সব দেশের সরকারপ্রধানের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে একটি বার্তা পাঠান।[৯৪] ১৭ আগস্ট জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন।[৯৫] আন্তর্জাতিক জুরি কমিশনের সেক্রেটারী জেনারেল ম্যাকভারমেন্ট স্বাক্ষরিক ১৭ আগস্টের বার্তায় বলা হয়, 'শেখ মুজিবের গোপন বিচারের জন্য সমগ্র বিশ্ব শঙ্কিত, এ বিষয়ে ইয়াহিয়াকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।' সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, 'শেখ মুজিবের বিচার হলো আন্তর্জাতিক আইনের সর্বজনগ্রাহ্য আইনের অবমাননা। শেখ মুজিব নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন এটাই তার বড় অপরাধ।[৯৬] বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ ইয়াহিয়াকে ভেবে চিন্তে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা আর ১৯৬৫ সালের মত যুদ্ধ দেখতে চাই না।'[৯৭] ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৩০ জন সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লেবার পার্টির এমপি জন স্টোন হাউস প্রস্তাবটি উত্থাপনকালে বলেন, পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটছে তা বন্ধ করতে হলে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ ছাড়া লেবার পার্টির এমপি রেজিনাল্ড প্রেন্টিস ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলিস ডগলাসকে অনুরোধ করেন শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য।[৯৮] ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুলতান খান মস্কো গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁন্দ্রে গ্রোমিকো সরাসরি বলেন, 'কূটনীতির মারপ্যাচ বাদ দিয়ে আমি সোজাসুজি বলতে চাই, 'এটি ঠিক হচ্ছে না এবং এ ধরনের পদক্ষেপ আপনাদের পক্ষে যাবে না'।[৯৯] ২৭ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়।[১০০] বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারে সমগ্র বিশ্ব সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমনকি পাকিস্তানের পরম বন্ধু হেনরি কিসিঞ্জারও ইয়াহিয়াকে ভৎসনা করেন 'এ রকম কাজ না করতে।[১০১] এ ছাড়াও *কায়হান ইন্টারন্যাশনাল*, *নিউজ উইক*, *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন*, *দ্য টাইমস*, *রয়টার্স*, *দ্য স্টেটস ইকো*, *দ্য ওয়েস্ট অস্টেলিয়ান*, *দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া*, *দ্য এস্টেটম্যান*, *ল ফিগারো*, *আল আইয়াম*সহ বিশ্বের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।[১০২]

ফাঁসির মঞ্চে বঙ্গবন্ধু

মিয়ানওয়ালী কারাগারের 'জোনানা' ফটকে বঙ্গবন্ধুকে রাখা হয়। সেটা ছিল মহিলাদের ব্যারাক। তাদেরকে অন্য ব্যারাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। জেনানা ফটক ছিল ১০ নম্বর সেলের ঠিক পিছনে, যেখানে ভারতীয় বন্দিদের রাখা হয়েছিল। 'নরকসেম' সেলের বাইরে বঙ্গবন্ধুর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। একদিন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ফজলদাদ ভারতীয় বন্দিদের ব্যারাকে যান। দুই সেল থেকে ৮ জনকে বাঁছাই করেন। পুলিশ অফিসার তাদের ৮ ফুট লম্ব, ৪ ফুট প্রশস্ত ও ৪ ফুট গভীর একটি গর্ত খুঁড়ার হুকুম দেন। নিরুপায় হয়ে তারা সেই হুকুম পালন করে। রাত

নয় টার মধ্যে কবর খোঁড়া হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে কবর দেয়া হবে। সেদিন ফাঁসি হলো না। আবার ওই আটজনকে ডেকে গর্ত ভরাট করে দেওয়া হলো। এরপর আবার তাদের দিয়ে গর্ত খোঁড়া হয়। এবারও ফাঁসির আদেশ স্থগিত করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া আবার ফাঁসির হুকুম দেন এবং কারা কর্তৃপক্ষকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। জানানো হয় যেকোন সময় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য টেলিগ্রাম যাবে। এভাবে তিনবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ফাঁসি কার্যকর করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার সময়ে অফিসার এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিজের বাংলোতে দু'দিন যাবৎ রক্ষা করল। এ দু'দিন আমার উপর কোন সামরিক পাহারা ছিল না। দু'দিন পরেই এই অফিসার আমাকে আবার একটি আবাসিক কলোনির নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিল। সেখানে আমাকে হয়ত চার-পাঁচ কিংবা ছয় দিন রাখা হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ অফিসার বাদে কেউ জ্ঞাত ছিল না।[১০৩] ২৬ ডিসেম্বর একটি আর্মি হেলিকপ্টার এসে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডির বাইরে কোন এক বাংলোয় নিয়ে যায়। এরপর বঙ্গবন্ধুর বাঁচার সম্ভাবনা দেখা দেয়।[১০৪]

মুজিব-ভুট্টো আলোচনা

২৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর সাথে ভুট্টো সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু দর্শনার্থী কক্ষে ঢুকেই ভুট্টোকে দেখে প্রশ্ন করেন 'আপনি এখানে কিভাবে এলেন? উত্তরে ভুট্টো বলেন, 'আমি এখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট। বঙ্গবন্ধু বলেন, আগে বলুন আমি মুক্ত না বন্দি?[১০৫] ভুট্টো বারবার আবেদন করেন কোনভাবেই পাকিস্তানকে এক রাখা যায় কি না। ভুট্টো এমনও বলেন, 'আলোচনা পাকিস্তানে হবে এমন নয়, যেকোন দেশে হতে পারে। যেমন, ইরান, সুজারল্যাণ্ড, কেবল দু'জনের আলোচনা। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি এখনও আপনার বন্দি। এমনকি আমার স্ত্রীকেও আমি টেলিফোন করার অধিকারী নই। আমি জানি না, তিনি এখনো পর্যন্ত জীবিত আছেন কি না। আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি আমাকে জোর করে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন। আপনি আমাকে গুলি করে মারতে পারেন। কিন্তু ঢাকায় গিয়ে আমার মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা না করে আমি স্বাক্ষর দেব না।[১০৬] তিনি আরো বলেন, 'আগে দেশে যাব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব। এর আগে কোন কথা নয়'।[১০৭] ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের টেলিভিশনে বঙ্গন্ধুর মুক্তি সম্পর্কে জনতার মতামত সংক্রান্ত এক সংবাদ প্রচারিত হয়। মতামত জরিপে সবাই তাঁকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে মত দেন।বঙ্গবন্ধু'শাহুল্লা রেস্ট হাউস' থেকে সে চিত্র দেখেন।[১০৮] বিকালে করাচীর নিস্তার পার্কের জনসভায় লক্ষ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে হ্যাঁ বললে ভুট্টো বলেন, 'আপনারা আমার ঘাড়ের একটা বিরাট বোঝা নামিয়ে দিলেন।'[১০৯] গার্ডিয়ান পত্রিকায় ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে আগামী ৩ দিনের মধ্যে লন্ডন তথা জেনেভার মত কোন নিরপেক্ষ স্থানে পাঠানো হবে।[১১০]

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার চূড়ান্ত হয়। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) রাত ১০ টায় তাঁকে ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে হাজির করা হয়। এরপর বিমান যায় করাচী। কেননা করাচীতে ছিলেন ড. কামাল হোসেনের স্ত্রী ও দুই শিশু কন্যা।[১১১] মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধু ও কামাল হোসেনকে বিমানের সামনে আনা হয়। বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টো এক সাথে বিমানে ওঠেন। করমর্দন করেন। একে অপরকে

আলিঙ্গন করেন। ভুট্টোর দুই গণ্ডদেশে চুমু খান বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে দু'টি পাইপ ও জায়নামাজ উপহার দেন ভুট্টো।[১১২] বঙ্গবন্ধু জায়নামাজ হাতে নিয়ে হেসে বলেন, 'এয়ার মার্শাল আপনার ওপিআইএ-এর জন্য দোয়া করব। রাত তিনটার দিকে বোয়িং ৭০৭ বিমান আশাকে উড্ডয়ন করে। তখন ভুট্টো বলে ওঠেন, 'চিড়িয়া উড় গ্যায়া'–পাখি উড়ে গেছে। এয়ার মার্শাল জাফর বিমানে উঠে যাত্রীদের বলেন যে, মিন কোথাও নামবে না। মাত্র ১ ঘণ্টা আগে জানা যাবে যে, একটি বিশেষ বিমান আসছে তাতে শেখ মুজিব আছেন। তাঁকে আপনাদের কাছে হস্তান্তর করতে চাই। সেদিন ছিল রবিবার-ছুটির দিন। বিদেশ মন্ত্রকের কর্মরত অফিসার একটি জরুরি বার্তা পান ৮ জানুয়ারি ভোর ৫.২০মিনিটে। তাতে বলা হয়, একটি অনির্ধারিত পিআইএ-এর বিমান শেখ সাহেবকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, যা হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে ১ ঘন্টার মধ্যে। ঐদিন বিবিসি ওয়াল্ড সার্ভিসে ভোরের খবরে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন আগমনের বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়। বিবিসি টেলিভিশন নিয়মিত অনুষ্ঠান স্থগিত করে দিয়ে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুর রমহানের অবতরণের খবর লাইভ প্রচার ও বিশেষ বুলেটিন শুরু করে-তাদে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গলা খোলা শাদা শার্ট গায়ে এবং ধূসর রঙের স্যুট পরে মুখে পাইপ দেয়া অবস্থায় হাসি মুখে বলছেন 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বন্দি শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে রীতিমত বেঁচে আছি।'[১১৩] বঙ্গবন্ধুকে ফেরত পাঠানোর দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ।[১১৪] সকাল ৬.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রথমে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সাবেক হাইকমিশনার রেজাউল করিমকে ফোন করেন।[১১৫] ফোনের কথা ছিল, রেজাউল! আমি শেখ মুজিবুর রহমান বলছি। তাড়াতাড়ি এসো। আমি বিমানবন্দরে আছি। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিমানবন্দরে পৌছান। এরপর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে হোটেল ক্যারিজে ওঠেন।[১১৬] রয়টার্স সেদিন শিরোনাম করেছিল 'লন্ডনে শেখ মুজিব'।[১১৭] হিথ্রো বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জে বৈদেশিক দপ্তরের কর্মকর্তারা তাঁকে স্বাগত জানান। সেখানে ছুটে আসেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র অফিসের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা স্যার ইয়ারমাদারল্যান্ড। তিনি বঙ্গবন্ধুকে জানান, ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিতে এসেছেন তাঁকে। সকাল বেলা বিখ্যাত ক্যারিজ হোটেলে অবস্থানকালেই আমেরিকার সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। সেখানে ছুটে এসেছিলেন সেই সময়ের বৃটেনের বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলিয়াম যিনি পরবর্তীতে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে করমর্দন করে সর্বপ্রথম Good Morning Mr. President বলে সম্বোধন করেছিলেন তিনি।[১১৮] হোটেল ক্যারিজে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চারশত সাংবাদিক।[১১৯] বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে সেদিন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁর সরকারি সফর সংক্ষিপ্ত করে ফিরে এসেছিলেন লন্ডনে। বিকেল ৫টায় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যাবতীয় রীতি উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে বহন করা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন যতক্ষণ না বঙ্গবন্ধু গাড়িতে ওঠেন। যদিও এডওয়ার্ড হিথের বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া সম্মান নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন। উত্তরে হিথ বলেছিলেন, 'আমি জানি কাকে সম্মান জানাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন একটি জাতির মুক্তিদাতা মহান বীর। তাঁকে এই সম্মান প্রদর্শন করতে পেরে বরং আমরাই

সম্মানিত হয়েছি।'[১২০] প্রধানমন্ত্রী মি. হিথের সাথে এক ঘন্টাকাল বৈঠকের সময় বঙ্গবন্ধু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বৃটেন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী এই মর্মে বিশ্লেষণ করেন যে, নয়া সরকারকে আশ্বাস দিতে হবে যে, পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অবশ্য উভয়ের আলোচনায় পরিস্কার হয়ে যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বৃটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে।[১২১]

বঙ্গবন্ধু হোটেল ক্যারিজে থেকে ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকায় পরিবারের সাথে কথা বলেন। টেলিফোনে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম প্রশ্ন ছিল 'বেঁচে আছ তো? তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে আধা ঘন্টা কথা বলেন। প্রথমে বড় ছেলে শেখ কামাল, পরে ক্রমান্বয়ে বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহেনা ও ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। বেগম মুজিব আবেগঘন কণ্ঠে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এনা পরিবেশিত এক খবর থেকে জানা যায়, 'বেগম মুজিব সাংবাদিকদের জানান তিনি আবেগে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে প্রথমবার কথা বলতে পারেননি। দ্বিতীয়বার কল আসলে বঙ্গবন্ধু জানতে চান, 'আমি কেমন আছি'। আমি বললাম ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?[১২২] তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথেও কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলার মুক্তি সংগ্রামে আজ আমি স্বাধীনতার অপরিসীম আনন্দ অনুভব করছি। এই মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার দেশ যখন আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করে, তখন আমি রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে একটি নির্জন পরিত্যক্ত সেলে বন্দি জীবনযাপন করছি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন ও সহযোগিতা দেবার জন্য ভারত, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বৃটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থনকারী মার্কিন জনগণ ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও এখানে থাকতে চাই না। আমি আমার জনগণের কাছে যেতে চাই।[১২৩] তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ১০ মিনিট কথা বলেন। ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'মেহেরবানি করে যেন দিল্লিতে একটু বিরতি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তাতে রাজি হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন লন্ডনে ভারতের হাইকমিশনের ফাস্ট সেক্রেটারি ভেদ মারওয়া যিনি লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসার পথে বিমানে বঙ্গবন্ধুর পাশেই বসে ছিলেন। তিনি বলেন, 'তাঁর মত মানুষ আমি আর দেখিনি। শেখ মুজিব বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কথায় মনে হচ্ছিল পুরো বাংলাদেশটাই তার হাতের মুঠোয়। যেন তিনিই ছিলেন বাংলাদেশ।'[১২৪]

দিল্লীতে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু মাত্র একদিনের যাত্রা বিরতি করেছিলেন লন্ডনে। এরপর তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া একটি বিশেষ রাজকীয় বিমানে ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাত ২.৩০ মিনিটে বিমানটি হিথ্রো বিমানবন্দর ছাড়ার পর বিবিসি ঘোষণা দেয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। পথে সাইপ্রাসের ব্রিটিশ বিমান ঘাঁটি ও ওমানে যাত্রা বিরতির পর দিল্লিতে অবতরণ করে।[১২৫] ১০ জানুয়ারি সকাল ৮.১০ মিনিটে দিল্লির পানামা বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী রাজকীয় বিমান 'কমেট' অবতরণ করে।[১২৬] এ সময় তাঁকে রাষ্ট্রপতির সম্মান জানানো হয়। ২১ বার তোপোধ্বনি দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে দুই দেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' আর

'জনগণ মন' ব্রাসব্যান্ডে বেজে ওঠে।[১২৭] বঙ্গবন্ধু কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সে সময় ২৪টি দেশের রাষ্ট্রদূত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ভারত এবং ভারতবাসীরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আমার এই যাত্রা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, করেছেন বীরোচিত আত্মত্যাগ। আমার মানুষের কাছ থেকে যখন আমাকে ছিনিয়ে নেয়া হলো, তারা কেঁদেছিল, আমি যখন কারাগারে, তারা চালিয়েছিল সংগ্রাম, আর আজ আমি যখন ফিরছি, তারা বিজয়ী।'[১২৮] রাষ্ট্রপতি ভবনে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ৩৫ মিনিট একান্তে আলাপ করেন। তখন বঙ্গবন্ধু ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন, 'ম্যাডাম, আপনি কখন বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন? উত্তরে গান্ধী বলেন, 'তিনি যখন চাইবেন তখনই প্রত্যাহার করা হবে'। তিনি আরো বলেন, 'আগামী ১৭ মার্চ আপনার জন্মদিনে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।'[১২৯] ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি।[১৩০] এ সময় বঙ্গবন্ধু আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন।[১৩১] বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ৯০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়।[১৩২]

সোওরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সোমবার বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বেলা ১টা ৪১ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারি বিমানটি তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানের সিড়িতে ওঠে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরেন। সেসময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। অশ্রুসিক্ত নয়নে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা বেঁচে আছিস?'[১৩৩] তিনি স্বয়ং তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে আখ্যায়িত করেছিলেন–'অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্র'।[১৩৪] ১০ জানুয়ারি তৎকালীন বিহার রাজ্য আজকের ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর প্রবাসী বাঙালি মেয়ে কমলা দেবী বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লেখেন, 'পরম শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবুর রহমান। আমি ভারতবাসী, জামশেদপুরের মেয়ে, আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আপনি ফিরে এসেছেন অন্ধকারের কারাগৃহ থেকে স্বাধীন বাংলার নতুন আলোকে-এ এক দুর্লভ শুভলগ্ন... ।'[১৩৫]

বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।[১৩৬] বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে যান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বিকাল ৫টায় প্রায় ১০ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন। বিমানবন্দর থেকে সভাস্থল পৌঁছতে সময় লেগেছিল প্রায় দু'ঘণ্টা। জনতার উত্তাল সমুদ্র ভেদ করে বঙ্গবন্ধু সভাস্থলে উপস্থিত হন। ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে উঠে ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকালেন এং রুমালে চোখ মুছে চিরাচরিত ভঙ্গিতে 'ভায়েরা আমার' বলে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা।[১৩৭] বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলেন, 'গত ৭ মার্চ (১৯৭১) এই ঘোড়দৌড়ের ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সাংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[১৩৮] আপনারা বাংলার মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। যড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।'[১৩৯]

তিনি আরো বলেন, ‘আপনারা আরো জানেন যে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য করবও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবার মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আমি তাদের নিকট নতিস্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।’[১৪০] তিনি আরো বলেন, ‘আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেকক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।’[১৪১] তিনি বলেন, ‘আপনারা দেশের জন্য, আমার জন্য অকাতরে রক্তপাত করেছেন, জীবন দিয়েছেন–প্রয়োজনে আমি বাংলার জন্য, জনগণের জন্য জীবন দিয়ে সকলের সব ঋণ পরিশোধ করে যাব।’[১৪২] ‘আমি আবার আপনাদের কাছে এসেছি। লাখ লাখ ভাই, মা আর বোন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার প্রতি ভালোবাসার কোন পরিমাপ নেই। এর কোনো প্রতিদান আমি দিতে পারিনি।’[১৪৩] বঙ্গবন্ধু আবেগজড়িত কণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘সাত কোটি বাঙালির হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি’– ‘আজ আপনি দেখে যান আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হয়েছে। আমার মানুষ আজ মুক্ত মানুষ হয়েছে, বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।’[১৪৪] ‘আমার বিশ্বাস, আমার আদর্শ আর সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্যই আমি এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পেরেছি। এই জনগণ আমাকে তাদের ভাই, তাদের পিতা এবং তাদের নেতা হিসেবে ভালোবাসে।’[১৪৫]

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তেফা দিয়ে ১২ জানুয়ারি (১৯৭২) স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৪৬] এরপর তিনি দেশের সংবিধান রচনা ও তা গণপরিষদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। সংবিধান পাশ হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং দেশের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব আরো পাঁচ বছরের জন্য গ্রহণ করে।[১৪৭] কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, স্তম্ভিত হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর মানবতাবাদী নেতা উইলি ব্রান্ট বলেছিলেন, ‘এই নির্মম মৃত্যুই যদি মুজিবের প্রাপ্য ছিল তাহলে বাংলাদেশের জন্মের কোন প্রয়োজন ছিল না’। মিয়ানওয়ালী কারাগারের প্রিজন হাবীব আলী বলেছিলেন, ‘বাঙালিরা মহা সৌভাগ্যবান যে, শেখ মুজিবের মত একজন নেতা পেয়েছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, যে পাকিস্তানের কারাগার বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারেনি, মৃত্যুদণ্ড দিয়েও কার্যকর করতে পারেনি, অথচ তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে সাড়ে ৩ বৎসরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিজ বাসভবনে স্বপরিবারে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ‘বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী; আর পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘস্থায়ী’। বাঙালি জাতিকে আজীবন এ গ্লানি বহন করে যেতে হবে।’[১৪৮]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সংগ্রামী মহানায়কের নাম। দীর্ঘ নয়টি মাস তিনি কারাগারে চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন। অত্যাচার-নির্যাতনে শুকিয়ে তাঁর ওজন ৪০

পাউণ্ড কমে গেছে।[১৪৯] তবুও দেড় হাজার মাইলের দূরবর্তী পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে যুগিয়েছেন মরণপণ লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। তাঁর আদর্শ আর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে। ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাঁর অতল দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা, সাহসিকতা ইত্যাদি গুণাবলী তাঁকে বিশ্ব দরবারে হিমালয়সম উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। ছাত্র-জনতার পক্ষে সভার সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান করা হয়। (সূত্র: এম আর আখতার মুকুল, মহাপুরুষ (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৩), পৃ. ৯২।

২. তদেব, পৃ. ১৭।

৩. কবীর চৌধুরী (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, দ্বিতীয় মুদ্রণ (ঢাকা: অন্বেষা, ২০১২), পৃ. ৫০।

৪. তদেব, পৃ. ১৭৬।

৫. তদেব, পৃ. ১৭৫।

৬. ড. মোহাম্মাদ আজিবার রহমান, ‘রক্তঋণ’ (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০২১), পৃ. ৪১।

৭. মো. জাকির হোসেন, বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ও শত্রুতা, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৯ আগস্ট, ২০১৫।

৮. তোফায়েদ আহম্মেদ, জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তব্য, একুশে টেলিভিশনে প্রচারিত, ১৮ জানুয়ারি, ২০২০।

৯. মিজান রহমান (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৩৬২।

১০. তদেব, পৃ. ৩৬২।

১১. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি (ঢাকা: অনন্যা, ২০১০), পৃ. ২২৬।

১২. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে (ঢাকা: অনন্যা, ২০১০), পৃ. ১১।

১৩. Rehman Sobhan, Untranquil Recolletion: The Year of Fulfilment (Yew Delhi: Sage, 2016), p. 342.

১৪. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৮১-৮২।

১৫. ড. মোহাম্মাদ আজিবার রহমান, রক্তঋণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

১৬. Asghar Khan, We Have Learnt Nothing From History (Dhaka: UPL, 2006), p. 42.

১৭. মুনতাসির মামুন, রাজাকার সমগ্র (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৯), ২৮১।

১৮. রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম (অনু.) (ঢাকা: ইউ.পি.এল, ১৯৯৬), পৃ. ৮৬।

১৯. Lt. General A.A.K. Niazi, The Betrayal of Pakistan (Dhaka: UPL, 2010), p. 32.

২০. কবীর চৌধুরী (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

২১. তদেব, পৃ. ১২৭।

২২. তদেব, পৃ. ১২৭।

২৩. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

২৪. গাজীউল হক, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম (ঢাকা: সন্ধানী, ১৯৯৭), পৃ. ১০৬।

২৫. কবীর চৌধুরী (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

২৬. তদেব, পৃ. ১২৭।
২৭. মযহারুল ইসলাম, আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা, *অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইফাবা, মার্চ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৮।
২৮. Siddiq Salik, Witness to Surrender, Dhaka: The University Press Limited, First Published 1997, p. 75.
২৯. কবীর চৌধুরী (সম্পা.),বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৩০. তদেব, পৃ. ১৮।
৩১. ড. মোসা. ছায়িদা আকতার, আওয়ামী লীগের ভাবাদর্শিক বিকাশ (১৯৪৯-১৯৭২), (ঢাকা: ফেমাস বুকস্, ২০১৯), পৃ. ১৬৯।
৩২. কবীর চৌধুরী (সম্পা.),বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।
৩৩. তদেব, পৃ. ১২৭।
৩৪. দিব্যদ্যুতি সরকার, বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০২০), পৃ. ৮৬।
৩৫. Siddiq Salik, Opcit, p. 75.
৩৬. Ibid, p. 77
৩৭. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।
৩৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা' সালাউদ্দিন আহম্মদ (সম্পাদিত), 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৩৮৭)।
৩৯. ড. মোঃ মকসুদুর রহমান, বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শের নাম (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০২২) পৃ. ১৫২।
৪০. *দৈনিক প্রথম আলো*, 'দুঃসাহসী হে ফরাসি মুক্তিযোদ্ধার সন্ধানে', নিজস্ব প্রতিবেদক, ২ জানুয়ারি, ২০১৬।
৪১. *তদেব।*
৪২. 'My All Garbage' নামক শিক্ষা সহায়ক ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।
৪৩. ড. সুলতান মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধ: প্রস্তুতি থেকে বিজয় (ঢাকা: কথা প্রকাশ, মে ২০২১), পৃ. ১০।
৪৪. 'My All Garbage' নামক শিক্ষা সহায়ক ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।
৪৫. ড. সুলতান মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধ: প্রস্তুতি থেকে বিজয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৪৬. শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০২০), পৃ. ১৩৭।
৪৭. (ড. সুলতান মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধ: প্রস্তুতি থেকে বিজয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।
৪৮. শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।
৪৯. ড. সুলতান মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধ: প্রস্তুতি থেকে বিজয়, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৯-৩০।
৫০. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. x।
৫১. ড. মো. মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাতকাহন (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯), পৃ. ১৬৩।
৫২. শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ডিসেম্বর ২০১৮), পৃ. ৭।
৫৩. ড. মো. মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাতকাহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
৫৪. মমিনুল হক খোকা, অস্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল: বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও আমি (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১৬০-৬১; রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ৭১-এর দশমাস (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৫৮।
৫৫. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, রাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৫), পৃ. ৯৬।
৫৬. শেখ হাসিনা, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৬৩।
৫৭. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা: খোশরোজ কিতাবিস্তান, ২০০২), পৃ. ৫৭৭।
৫৮. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ: জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৪৫।

৫৯. হাসান মাহামুদ, পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর প্রতিষ্ঠার আলোচনায় ভাটা, *রাইজিংবিডি ডট কম*, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭।
৬০. মিজান রহমান (সম্পা.),প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩।
৬১. তদেব, পৃ. ৩০২।
৬২. শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ২৭৭।
৬৩. মিজান রহমান (সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪।
৬৪. শামস সাইদ, মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর দিনগুলি, *অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইফাবা, মার্চ, ২০১৯), পৃ. ৬০।
৬৫. S.A. Karim, Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy (Dhaka: UPL, 2014), p. 225.
৬৬. Robert Payne, Massacre (New York: Macmillan Company, 1973), p. 97.
৬৭. এম আর আখতার মুকুল, চল্লিশ থেকে একাত্তর (ঢাকা: অনন্যা, ২০১২), পৃ. ৮৭।
৬৮. কবীর চৌধুরী (সম্পা.),বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, ২০১২), পৃ. ২০।
৬৯. শামস সাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৭০. হাসান ফেরদৌস, ১৯৭০: বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া (ঢাকা: প্রথমা, ২০০৯), পৃ. ১২৫।
৭১. শামস সাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৭২. ড. মো. মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাতকাহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।
৭৩. গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ: একটি নির্দলীয় ইতিহাস (ঢাকা: প্রথমা, ২০১০), পৃ. ১৩১।
৭৪. এম আর আখতার মুকুল, চল্লিশ থেকে একাত্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
৭৫. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।
৭৬. আহমদ সালিম, মুফিদুল হক অনূদিত, পাকিস্তান কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ৪৯।
৭৭. Robert Payne, Opcit., p. 97.
৭৮. দিব্যদ্যুতি সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
৭৯. শামসুজ্জামান শামস, বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৪৩।
৮০. মমতাজউদদীন আহমদ, রক্ত যখন দিয়েছি (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৮), পৃ. ১৮০।
৮১. গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ: একটি নির্দলীয় ইতিহাস (ঢাকা: প্রথমা, ২০১০), পৃ. ১৩১।
৮২. ড মোঃ আবু তাহের, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও অতঃপর, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮।
৮৩. হাসান ফেরদৌস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
৮৪. ড মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮।
৮৫. দিব্যদ্যুতি সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
৮৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮।
৮৭. দিব্যদ্যুতি সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
৮৮. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।
৮৯. Robert Payne, Opcit. p. 130.
৯০. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।
৯১. তোফায়েল আহমদ, ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ (ঢাকা: ১৯৮৬), পৃ. ১৪।
৯২. এ কে এম আতিকুর রহমান, পাকিস্তানের জেলে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রসঙ্গে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৪ আগস্ট, ২০১৬।
৯৩. তদেব।
৯৪. তদেব।
৯৫. তদেব।
৯৬. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

৯৭. Srinath Raghavan, Global History of the Creation of Bangladesh (London: Harvard University Press, 2013), p. 230.

৯৮. এ কে এম আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, ১৪ আগস্ট, ২০১৬।

৯৯. মহিউদ্দিন আহমদ, আওয়ামী লীগ: যুদ্ধদিনের কথা-১৯৭১ (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৭), পৃ. ১২৯।

১০০. কবীর চৌধুরী (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১০১. G.J. Bass, Blood Telegram: Indian’s Secret War in East Pakistan (India: Random House, 2013), p. 245.

১০২. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৮৬।

১০৩. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০।

১০৪. শামস সাইদ, মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর দিনগুলি, *অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইফাবা, মার্চ, ২০১৯), পৃ. ৬৫-৬৭।

১০৫. তদেব, পৃ. ৬৭।

১০৬. আব্দুল মতিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: মুক্তিযুদ্ধের পর (ঢাকা: র‌্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৫-১৬।

১০৭. Anthoney Mascarenhas, The Rape of Bangladesh (Delhi: Vikash Publication, 1971), p. 5.

১০৮. ফারুক চৌধুরী, স্মরণে বঙ্গবন্ধু (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ৩৩-৩৪।

১০৯. বাংলাট্রিবিউন, ৮ জানুয়ারি, ২০২০।

১১০. আব্দুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১১১. S.A. Karim, Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy (Dhaka: UPL, 2014), p. 253.

১১২. শামস সাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১১৩. আহমদ সালিম, মফিদুল হক অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১১৪. ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, জাতির পিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি(ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০২০), পৃ. ৯০।

১১৫. তদেব, পৃ. ৯০।)

১১৬. এস.এম রেজাউল করিম, কূটনীতিকের ডাইরি (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৭-১৮।

১১৭. বাংলাট্রিবিউন, ৮ জানুয়ারি, ২০২০।

১১৮. ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

১১৯. তদেব, পৃ. ৯২।

১২০. উপ-সম্পাদকীয়, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৯ জানুয়ারি, ২০২০।

১২১. মমতাজউদদীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

১২২. সুভাষ সিংহ রায়, ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির কথা জানতে পারলো, *জাগো নিউজ২৪.কম*, ৭ জানুয়ারি, ২০২১।

১২৩. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩।

১২৫. মমতাজউদদীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

১২৬. শশাঙ্ক এস, ব্যানার্জী, তানভীর চৌধুরি অনূদিত, ভারত, মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান (ঢাকা: অপরাজিতা ভবন, ২০১৪), পৃ. ১৭৪।

১২৭. শামস সাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১২৮. ফারুক চৌধুরী, জীবনের বালুকাবেলায় (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৪), পৃ. ১৯৯।

১২৯. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

১৩০. এম. আর. আখতার মুকুল, মহাপুরুষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১৩১. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৫৬৩।

১৩২. হুমায়ুন আজাদ, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৪৫।

১৩৩. কবীর চৌধুরী (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

১৩৪. মমতাজউদদীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

১৩৫. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), মুজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩।

১৩৬. উপ-সম্পাদকীয়, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্র, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৯ জানুয়ারি, ২০২০।

১৩৭. শামসুজ্জামান শামস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৩৮. ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, প্রগুক্ত, পৃ. ৯৯।)

১৩৯. বঙ্গবন্ধুর লেখা সেই চিঠি ও কমলা দেবী, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.* কম, ২১.০২.২০১২।

১৪০. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫।

১৪১. তদেব, পৃ. ২১।

১৪২. তদেব, পৃ. ২১।

১৪৩. মহিউদ্দিন আহমেদ খান (সম্পা.), বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (ঢাকা: মুকদেশ প্রকাশন, জুলাই, ২০১৯), পৃ. ২০৬।

১৪৪. মমতাজউদদীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১৪৫. এম আর আখতার মুকুল, চল্লিশ থেকে একাত্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১৪৬. শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

১৪৭. মিজান রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১৪৮. ড মোঃ আবু তাহের, মিয়ানওয়ালীকারাগার বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও অতঃপর, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮।

১৪৯. ১০ জানুয়ারি (রোববার), ২০২১ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,‘অত্যাচার-নির্যাতনে বঙ্গবন্ধু শুকিয়ে যান, ৪০ পাউণ্ড ওজন কমে যায়।’ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন তিনি।